সাব-ইন্সপেক্টর

সাব-ইন্সপেক্টর
সাব-ইন্সপেক্টর

সাব-ইন্সপেক্টর

নিমাই ভট্টাচার্য

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত
শ্রীমতী মণীষা দত্ত
প্রিয়বরেষু

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, ককটেল, তোমাকে, পিকাডিলী সার্কাস, উইং কমাণ্ডার লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী।

সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়ত আরো বেরোবে, সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা ও মুদ্রিত স্বাক্ষর দেখে নেবেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

মাঝে মাঝেই আমি কাশী যাই। একটু এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করার পরই চলে যাই দশাশ্বমেধ ঘাট। অথবা পাশের কেদারঘাট। চুপচাপ বসে থাকি। আকাশ-পাতাল ভাবি। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করি। অনেক অনেক কথা মনে পড়ে। অনেক মানুষের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একের পর এক। অনেক মানুষের ভীড় হয় আমার মনের পর্দায়। মনে মনে তাদের সঙ্গে কথা বলি, তাদের কথা শুনি। কখনও হাসি, কখনও কাঁদি। কখনও খুশিতে মন কানায় কানায় ভরে ওঠে; কখনও ব্যথা-বেদনায় মুষড়ে পড়ি।

তবে সবই মনে মনে। আমার আশেপাশে কত মানুষের ভীড়, কিন্তু তারা কেউ জানতে পারেন না আমি আপন মনে বিভোর হয়ে আছি আমার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির স্মৃতির অরণ্যে।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার সামনে এসেই প্রায় চিৎকার করে বললেন, আরে, জামাইবাবু আপনি?

আমি চমকে উঠি। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাই কিন্তু ঠিক চিনতে পারি না।

উনি বুঝতে পারলেন, আমি ওকে চিনতে পারিনি। তাই একগাল হাসি হেসে বললেন, অনেক পাল্টে গেছি ঠিকই কিন্তু তবু জামাইবাবুর চেনা উচিত ছিল।

ওকে এবার চেনা চেনা মনে হয়, কিন্তু···

উনি আর দেরী করলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, আমি আপনার কেষ্ট দারোগা। কেষ্ট ঘোষ।

কেষ্ট ঘোষ! কেষ্ট দারোগা! আমার রিপোর্টারী জীবনের প্রথম অধ্যায়ের অনেক দিনের অনেক কথা একসঙ্গে মনে পড়ে। আমি একটু বিহ্বল হয়েই ওকে জড়িয়ে ধরে বলি, কেষ্টদা, তুমি!

হ্যাঁ, আমি।

তুমি এত বদলে গেছ যে আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি।

কেষ্টদা হেসে বলল, শুধু আমি না, জামাইবাবু, তুমিও অনেক বদলে গেছ।

তা ঠিক, কিন্তু···

উনি যেন আমার কথা শুনেও শুনলেন না। বললেন, বোধ হয় বিশ-বাইশ বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা হল। এই বিশ-বাইশ বছরে শুধু আমি তুমি না, সারা পৃথিবীর সবকিছুই বদলে গেছে।

তা ঠিক, কিন্তু তবুও যে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ···

কেষ্ট দারোগা আবার হাসে। বলে, হাজার হোক অনেক দিন পুলিশে চাকরি করেছি। যাকে একবার ভালো করে চিনেছি তাকে সারা জীবনেও ভুলব না।

তার মানে? তুমি কি এখন পুলিশে নেই?

কেষ্ট দারোগা একটু ম্লান হাসি হাসে। বলে, না জামাইবাবু, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

সে অনেক কথা। পরে বলব। আগে বল, তুমি কেমন আছ?

বে কাশী এলে ? ক'দিন এখানে থাকবে !

আমি ওর প্রথম প্রশ্নের জবাব দিলাম না। শুধু বললাম, কালকেই সেছি। ভাবছি, পাঁচ সাতদিন থাকব।

এতক্ষণ দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম। এবার ষ্টদা নিজেও বসলেন, আমাকে বসালেন। বললেন, জামাইবাবু, মার আসল প্রশ্নের জবাবটাই দিলে না ?

এবার আমি একটু হেসে বললাম, খুব সুখে-শান্তিতে থাকলে কি ই সন্ধেবেলায় দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপচাপ একলা বসে থাকতাম !

কেষ্টদা একটু উদাস হয়ে উত্তরবাহিনী গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রপর আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক বলেছ জামাইবাবু, এই দশাশ্বমেধ টে যারা চুপচাপ বসে থাকে তারা কেউই সুখী না।

দু'পাঁচ মিনিট আমরা কেউই কোন কথা বলি না। শুধু আমি , কেষ্টদাও নিশ্চয়ই অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে মনে মনে।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেষ্টদা, তুমি কী এখানে বেড়াতে সেছ ?

না, বেড়াতে আসিনি। মেয়েটা এখানে এম. এ. পড়ছে। তাই আজকাল এখানেই থাকি

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, তুমি বিয়ে করলে কবে ? আমি যত ন কলকাতায় ছিলাম তত দিন তো তুমি বিয়ে করনি। এর মধ্যে বিয়ে করলে, মেয়ে হল ; আর সেই মেয়ে এম. এ. পড়ছে ?

কেষ্টদা আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসে। বলে, মানুষের জীবনে সব সম্ভব। এবার উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো আমার দিদিকে বিয়ে করতে পারলে না, কিন্তু তবুও তো…

আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত দিয়ে বলি, ও সব কথা এখন থাক। তারপর একটু হেসে বললাম, দেখছি তুমিও তোমার দিদিকে ভুলতে পারোনি।

দিদির সঙ্গে যার একবার পরিচয় হয়েছে, সে-ই দিদিকে কোন ভুলতে পারবে না।

আমি আবার হাসি। বলি, কেষ্টদা, তুমি আর ওর প্রশংসা কে না। অনেক কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। এখন তো কথা বল।

কেষ্টদা আর বসল না। উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাচ্ছিলাম ; ঠিক এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হল। তাই এখন দেরী করব না। কাল বিকেলে তাড়াতাড়ি আসব। তুমিও এ তখন কথাবার্তা হবে।

আচ্ছা।

কেষ্টদা চলে গেল, কিন্তু খানিক দূর গিয়েই আবার ফিরে এ বলল, জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেছি, তুমি কোথায় উঠেছ ?

হোটেলে।

হোটেলে উঠেছ ?

তবে আবার কোথায় উঠব ?

হোটেলে তোমার থাকতে হবে না। চল, চল আমার ওখানে থাকবে।

কিন্তু কেষ্টদা, আমি যে সাত দিনের ঘর ভাড়া জমা দিয়ে দিয়েছি

ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছ ? কিন্তু আমার ওখানে দুটো ঘর খালি প আছে। তুমি গেলে তোমার কোন অসুবিধে হত না।

আমি একটু হেসে বললাম, এবার বাদ দাও। পরের বার থে তোমার ওখানেই উঠব।

নিশ্চয়ই উঠবে। কেষ্টদা আর দেরী করেন না। দু-এক এগিয়েই মুখ ঘুরিয়ে বললেন, কাল তাড়াতাড়ি এসো।

আসব।

বহুদিন আগেকার কথা। আমি স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে ভর্তি য়েছি। বয়স নেহাতই কম। তবু হঠাৎ খবরের কাগজের রিপোর্টার য় গেলাম।

বিশেষ কিছুই রোজগার করতাম না কিন্তু বড়ই ব্যস্ততার মধ্যে দিন টত। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই টিউশানি করতে ছুটতাম। রে এসেই কলেজ। আবার টিউশানি। তারপর নোটবই পেন্সিল য়ে সভা-সমিতি সাংবাদিক সম্মেলনে। সন্ধ্যার পর কাগজের অফিস। ড়ি ফিরতে ফিরতে কোন দিন রাত দশটা-এগারোটা; কোন দিন বার একটা-দুটো।

কয়েক মাস পরে সভা-সমিতি-প্রেস কনফারেন্স ছাড়াও আমি ইটার্স বিল্ডিংস—লালবাজার যাওয়া শুরু করলাম। প্রথমে পরিচয়, র ঘনিষ্ঠতা হল কয়েকজন বিখ্যাত মন্ত্রীর সঙ্গে। সে সময় পশ্চিম লার কয়েকজন বিখ্যাত জমিদারও মন্ত্রী ছিলেন এবং তাদের দু- কজন আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

সেই রকম এক জমিদার মন্ত্রীর সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন আমার ই কেষ্টদা। পুরো নাম শ্রীকৃষ্ণ কুমার ঘোষ। আদি নিবাস যে কা জেলায় ছিল, তা ওর কথা শুনলেই বোঝা যেত।

কেন জানি না, কেষ্টদা বরাবরই আমাকে বেশ খাতির করত। র ঘরের সামনে গেলেই কেষ্টদা প্রশ্ন করত, দাদা, ক্যামন আছেন? লো তো?

তখন আমার ভালো থাকার কোন কারণই ছিল না। তবু বলতাম, , ভালোই আছি। আপনার খবর ভালো তো?

কেষ্টদা হাসতে হাসতে উত্তর দেয়, আপনা গো কৃপায় দিন চইলা লেই…

আমি ওর পুরো কথাটা শোনার আগেই মন্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়ি। কুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসি। হয়তো মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের ঘরে

একটু বসি। একটু গল্প করি। হয়তো এক কাপ চা খাই। কেষ্টদ
সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

মন্ত্রীর সঙ্গে কলকাতার বাইরে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে কেষ্টদার স
আমার ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল।

এইভাবেই দু-তিন বছর কেটে গেল।

তারপর একদিন সকালবেলায় কেষ্টদা হঠাৎ আমার বাড়িতে এ
হাজির। কোন ভূমিকা না করেই বলল, চটপট তৈরি হইয়া লন·

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন কার, কেন ? কোথায় যেতে হবে ?

দাদা বইলা যখন ডাকছি তখন অত-শত প্রশ্ন করেন ক ান ?

কী আর করব ? শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে বেরিয়েই পড়লাম। না, ট্রা
বাস নয়, ট্যাক্সি! ঘুরে বেড়ালাম নানা জায়গা। খেলাম ফ্রা
রাইস, চিকেন কারি, আইসক্রীম। সিনেমা দেখলাম সবচাইতে বে
দামের টিকিটে। আমি বার বার ওকে প্রশ্ন করেছি, কেষ্টদা,
ব্যাপার ? এমন পাগলের মতো খরচা করছ কেন ? এত আনন্দে
কারণ কী ?

কেষ্টদা মুচকি হেসে আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছে। বলে
দাদা অত ঘাবড়ান ক্যান ? আমার কোন কু মতলব নাই।

আমি সারাদিন ধরেই প্রশ্ন করেছি আর কেষ্টদা বারবারই এ
ধরনের উত্তর দিয়েছে। তারপর সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে যাবার আ
কেষ্টদা বলল, হঠাৎ বেশ কিছু উপার পাওনা জুইট্যা গেল! ত
ভাবলাম, ব্রাহ্মণরে কিছু দিইয়া ভোগ করনই উচিত।

ওর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত
মন্ত্রীর সিকিউরিটিতে আছ। তোমার আবার উপরি আয় হল কে
করে ?

কেষ্টদা ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, দা
আমাগো মতন পুলিশরে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলেও উপরি আয় হইবই।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। কেষ্টদা বলে, দাদা, আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলুম না।

পরে কেষ্টদা আমাকে সব বলেছিল।

জমিদার-মন্ত্রীর বাড়ীতে লাটসাহেব আসবেন ডিনার খেতে। জমিদারবাবু ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন, শনিবার লাটসাহেব ডিনার খেতে আসবেন। কালকেই নতুন ডিনার সেট কিনে আনবেন।

ম্যানেজারবাবু হাত কচলে বললেন, নিশ্চয়ই আনব স্যার।

পরের দিন ম্যানেজারবাবুর কেনা ডিনার সেট দেখেই জমিদার-মন্ত্রী রেগে লাল।—এতকাল আমাদের বাড়িতে চাকরি করেও আপনি কী আমাদের রুচি বুঝলেন না? এই রকম একটা থার্ড ক্লাশ ডিনার সেটে আমরা লাটসাহেবকে খেতে দিতে পারি?

বলির পাঁঠার মতো ম্যানেজারবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে কেষ্ট ঘোষ। হঠাৎ জমিদার-মন্ত্রী ওকে দেখেই বললেন, কেষ্ট, ভালো ডিনার সেট কিনে আনতে পারো?

কেষ্টদা মুখ নীচ করে চাপা গলায় জবাব দেয়, হ্যাঁ স্যার।

জমিদার-মন্ত্রী ম্যানেজারবাবুকে বললেন, কেষ্টকে কিছু টাকা আর একটা গাড়ি দিয়ে দিন। ও এখনই ঘুরে আসুক।

যে সময়ের কথা বলছি তখন দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। অধিকাংশ ইংরেজ ব্যবসাদারই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন। ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব, বা ইউনাইটেড সার্ভিসের ক্লাবের অবস্থা বেশ খারাপ। ফিরপো-গ্র্যাণ্ড-গ্রেট ইস্টার্ণেও খদ্দেরের ভীড় নেই। ফাইভ ইয়ার

প্ল্যানের কৃপায় নতুন বড়লোকও সৃষ্টি হয়নি। তাই নিউ মার্কেটে তখন রাহুর দশা। বহু দোকানেই নানা দেশের জিনিস রয়েছে কিন্তু খদ্দের নেই।

সুন্দর বিলেতী ডিনার সেট পেতে কেষ্টদার একটুও কষ্ট হল না। দাম? দেড়শো টাকা। কেষ্টদা একটু দরাদরি করতেই দোকানদার বললেন, এ সব জিনিস কেনার খদ্দের তো আর নেই। তাই কেনা দামেই দিয়ে দিচ্ছি। একশো পঁচিশই দিন।

কেষ্টদা দোকানদারকে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে বললেন, খুব সুন্দর করে প্যাক করুন আর ক্যাশ মেমোতে লিখবেন দুশো পাঁচ।

ডিনার সেট দেখেই জমিদার-মন্ত্রী খুশিতে ফেটে পড়লেন। ম্যানেজারবাবুকে বললেন, দেখুন, দেখুন, ভালো ডিনার সেট কাকে বলে।

ডিনার সেট দেখে জমিদার বাড়ির সবাই খুশি। বড় গিন্নীমা বললেন, দেশের বাড়ির জন্য এই রকম গোটা দুয়েক ডিনার সেট কিনে রাখলে ভালো হয়।

সেজ গিন্নীমা বললেন, রাঁচীর বাড়ির জন্যও আমার এই রকম সেট চাই।

বড় কুমার সাহেব বললেন, কাশীপুরের বাগানবাড়িতেও ভালো ডিনার সেট দরকার।

সব মিলিয়ে আট-দশটা সেটের অর্ডার হল।

দু-তিন দিন পরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কেষ্টদার সঙ্গে দেখা হতেই উনি আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, দাদা, ডিনার সেটের কৃপায় এই বোশেখ মাসেই আমাগো পূজার বাজার সারা!

জমিদার-মন্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত থাকার সময় কেষ্টদার অদৃষ্টে বেশ ভালোই উপরি পাওনা জুটত।...

কেষ্ট ঘোষের হাতে একটা কাপড়ের প্যাকেট দেখে জমিদার গিন্নী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, কেষ্ট, তোমার হাতে ওটা কী কাপড়?

কেষ্ট ঘোষ প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, মা, এটা খুব সাধারণ লংক্লথ।

জমিদার গিন্নী কাপড়ে হাত দিয়েই প্রশ্ন করেন, কত করে কিনলে?

হকার্স কর্ণার থেকে কিনেছি বলে এক টাকা দু' আনায়···

এত সস্তা?

কেষ্ট ঘোষ চুপ। একটু দূরেই ম্যানেজার দাঁড়িয়ে। তিনিও চুপ, কিন্তু অবশ্যই বিরক্ত। কারণ উনি জানেন, এই লংক্লথের গজ বড় জোর আট আনা-দশ আনা।

ভিতরের দুটো ড্রইংরুমের দামী সোফা আর নানা আসবাবপত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমে বড় জমিদার গিন্নীর ষাট গজের অর্ডার হল। তার পর এক টাকা দু' আনায় এক গজ লংক্লথ পাওয়া যায় শুনে তো মেজ ও ছোট জমিদার গিন্নীরা অবাক! তিন গিন্নীর মিটিং-এ ঠিক হল, এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে যখন বিশ-পঁচিশটা থান আনিয়ে রাখাই ভালো। হাজার কাজেই তো লংক্লথ লাগে।

কেষ্ট ঘোষের দিন বেশ আনন্দেই কাটে কিন্তু ম্যানেজারবাবু রেগে লাল। একদিন উনি আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন, কেষ্ট, চুরি-জোচ্চুরি বন্ধ কর। তা নইলে সত্যি বিপদে পড়বে।

কেষ্টদা হাসতে হাসতে জবাব দেয়, ম্যানেজারবাবু, রাগ করেন ক্যান্? আপনি তো কমলালয় স্টোর্স, ওয়াছেল মোল্লায় ক্যাশ মেমো ছাপাইয়া রাখছেন। এক টাকার জিনিস দশ টাকায়···

ম্যানেজারবাবু আর সহ্য করতে পারেন না। চিৎকার করে বলেন, আঃ! কেষ্ট!

বলতিছিলাম, আমার হকার্স কর্ণারে শুধু শুধু উৎপাত কইরা কষ্ট পান ক্যান্?

অনেক দিন পরে কেষ্টদার সঙ্গে দেখা হওয়ায় এ সব কথা মনে পড়ল। কেন জানি না, কেষ্টদাকে আমার বেশ ভালো লাগত। ওর মধ্যে এমন একটা সহজ-সরল ভাব ছিল যে ওকে বেশী দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। দিনে দিনে উনি আমার কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। সুযোগ-সুবিধা হলে দুজনে কার্জন পার্কে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে সুখ-দুঃখের কথা বলতাম।

তারপর এমন একদিন এলো যখন ওকে আমার নেপথ্য কাহিনী না বলে পারলাম না। ব্যস! এর পর থেকেই আমরা দুজনে কেষ্টদা দিদি জামাইবাবু হয়ে গেলাম।

এ সব অনেক দিন আগেকার কথা। কেষ্টদা প্রমোশন পেয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে থানায় বদলী হল। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হয়। একটু-আধটু কথাবার্তা হয়। হয়তো আশেপাশের রেঁস্তোরায় বসে একসঙ্গে চা খাই।

কয়েক মাস কেটে যায়। আবার হঠাৎ একদিন হাজরার মোড়ে কেষ্টদার সঙ্গে দেখা হয়। কেষ্টদা হাসতে হাসতে বলে, কাল বিকালে দিদির লগে দেখা হইল আর আইজ···

তাই নাকি?

হ! দিদি কয় নাই?

না, তোমার দিদির সঙ্গে দু-তিন দিন দেখা হয়নি।

কেষ্টদা ওর দিদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আবার দিদিও কেষ্টদার প্রশংসায় মুখর। আমি হাসি। কেষ্টদা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, জামাইবাবু, এখন তোমার বোঝনের টাইম হয় নাই দিদি আমার কী!

আজ এই কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে সেই সব ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ছে।

কলকাতা ছেড়ে দিল্লী যাবার আগে মানিকতলা থানায় গিয়ে কেষ্টদার সঙ্গে দেখা করলাম। ও আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, যাও ভাই, চইলা যাও। কোন ভয় নাই। দিদি আমার পরশ পাথর। তোমার মঙ্গল হইবই হইব।

॥ দুই ॥

পরের দিন পাঁচটার আগেই দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছলাম। ভাবলাম, কেষ্টদা আসার আগেই পৌঁছনো উচিত কিন্তু আমি পৌঁছেই দেখি, উনি এসে গেছেন।

তুমি এসে গেছ?

একটু আগেই এলাম।

এবার পাশে বসতে বসতে বললাম, কাল একটা কথা বলব বলব করেও বলা হয়নি।···

কোন্ কথা?

তোমার কথাবার্তা শুনে এখন বোঝাই যায় না, তুমি ঢাকার লোক।

কেষ্টদা একটু হাসল। একবার আনমনে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবে।

তারপর বলে জামাইবাবু, শুধু কথাবার্তা কেন, আমার অনেক কিছুই বদলে গেছে। আমি আর সে আমি নেই।

কেষ্টদা আর কিছু বলে না। চুপ করে বসে থাকে। গঙ্গা দেখে।

হয়তো বা দৃষ্টিটা দূরের রামনগরের দিকে প্রসারিত করে। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের অজ্ঞাতসারেই।

আমিও চুপ করে বসে থাকি। কোন কথা বলি না। বলতে পারি না।

কেষ্টদা আমার পাশে বসে থাকলেও মনে হয়, সে অনেক দূরের মানুষ। আমি আল্‌তো করে পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বললাম, কী হল কেষ্টদা? কী এত ভাবছ?

না, তেমন কিছু না। মাঝে মাঝে হঠাৎ পুরনো দিনের কথা মনে হয়। তাই আর কি···

আরে পুরনো দিনের কথা ভেবে আর কী লাভ? তা হঠাৎ তুমি পুলিশের চাকরি ছাড়লে কেন?

এবার কেষ্টদা একটু হেসে বলল, সব চাকরিতেই ভালো মন্দ আছে কিন্তু পুলিশের চাকরিতে শুধু নেংরামীই আছে। তাই···

কিন্তু পুলিশ না থাকলে চোর-জোচ্চোরকে শাস্তি দেবে কে?

ক'টা চোর-জোচ্চোর আর শাস্তি পায়? বারো আনা কেন. পনেরো আনা চোর-জোচ্চোর লম্পট-বদমাইসই শাস্তি পায় না।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কেন?

কেষ্টদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে একটা ঘটনা তোমাকে বলি।

সত্যি ঘটনা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি। আমি যখন বালীগঞ্জ থানায় ছিলাম, তখনকার ঘটনা।